দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বলে বাংলার জনমানুষের আকারে, অবয়বে, চেহারায় যেমন বৈচিত্র্য তেমনি নানা ভাষাজাতির সহাবস্থানের কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে গ্রাম ও কৃষিপ্রধান এই দেশে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানই বেশি চোখে পড়ে। প্রচুর নদী ও জলাভূমি এ দেশকে জালের মতো ঘিরে আছে বলে এদেশের মানুষের সংস্কৃতি নদীকেন্দ্রিক ও ঋতু বৈচিত্র্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। এ দেশের মানুষের সংস্কৃতি বুঝতে তার এই বৈচিত্র্যময় পটভূমি লক্ষ রাখা দরকার।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

১. ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায় বিচারে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কেমন তা ব্যাখ্যা করতে পারব;

২. এদেশের নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারব;

৩. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;

৪. বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি ও এর উপাদান বর্ণনা করতে পারব;

৫. বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধারণা

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ধর্মের ভূমিকা

মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ধর্ম খুবই বড়ো ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে আবহমানকাল থেকে বাস করে নানা ধর্মের মানুষ। মানুষের সামাজিক আচার-আচরণে তাই ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়।

চিত্র : মুসলমানদের ঈদ উৎসব

ইসলাম এদেশে আসে সুফিসাধকদের মাধ্যমে। মধ্যযুগে তুরস্ক, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত মানুষের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম সমাজের প্রসার ঘটেছে। দীর্ঘকালের পরিক্রমায় এদেশে বিশাল এক মুসলিম জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। মুসলমানদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। তাদের রয়েছে দুটি ঈদ উৎসব- ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা। তবে প্রাচীন কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মানুষেরা এদেশে পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে আসছে। বাংলার সংস্কৃতিতে পুঁথিপাঠ, বাউল মুর্শিদি গানসহ বিভিন্ন লোকগানে আর নকশিকাঁথাসহ অধিকাংশ লোকশিল্পে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের অবদান রয়েছে ।

চিত্র : হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় আবহমানকাল থেকে নানা পূজা-পার্বণ ও দেবদেবীর ভজনা করে আসছে। হিন্দুদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি। দেবতার প্রতিমা তৈরি ও এর সাজসজ্জা, অলংকরণ, পট নির্মাণ ইত্যাদি চারুকলার চর্চা যেমন রয়েছে তেমনি আরাধনা, আরতি মিলে ভক্তিমূলক নৃত্য, গীতের চর্চাও প্রচলিত রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাহাড়ের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর তেমন রয়েছে পানি উৎসব বা অন্যান্য পূজার আয়োজন আর তাদের বড়ো উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা।

চিত্র : বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান

বাংলাদেশে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের লোকও রয়েছে। বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের অনুসারী। তাঁরা বুদ্ধ পূর্ণিমায় উৎসবমুখর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায় নিজেদের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পার্বণ উদযাপন করে থাকে। বড়দিন বা যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিনে অবশ্য বড়ো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও আমন্ত্রিত হয়। দেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের আছে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। নববর্ষে, বসন্তে, বিয়েতে আনন্দময় উৎসবের আয়োজন করে তারা।

ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান পালনে পার্থক্য থাকলেও সব ধর্মের মূল শিক্ষা শান্তি ও সম্প্রীতি। বাংলার সাধারণ মানুষ আজীবন সেই ধারাই অনুসরণ করে আসছে।

ভাষা বিচারে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বললেও কিছু সংখ্যক অধিবাসী আছেন যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। যেমন- চাকমা, মারমা, গারো, খাসিয়া, মণিপুরি, সাঁওতাল ইত্যাদি। এভাবে ভাষার দিক থেকেও এদেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এদেশের মানুষের প্রধান ভাষা বাংলা হলেও এই ভাষার মধ্যে দিনে দিনে অনেক ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। হাজার বছর ধরে নানা জাতির মানুষ এসেছে বাংলাদেশে। তাদের ভাষার প্রভাব পড়েছে বাংলা ভাষায়। তাই বাংলা ভাষায় খোঁজ করলে পাওয়া যায় অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফার্সি, পর্তুগিজসহ অনেক বিদেশি ভাষার মিশ্রণ।

সম্প্রদায় বিচারে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

ধর্ম এবং ভাষার মতো সম্প্রদায়ের দিক থেকেও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখা যায় বাংলাদেশে। এদেশের ধর্ম সম্প্রদায়গুলো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রত্যেকের আলাদা সামাজিক জীবনযাপন পদ্ধতি আছে। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও প্রথা পালনে এক এক সম্প্রদায়ের এক এক ধরনের রীতি রয়েছে। সম্প্রদায়সমূহের প্রত্যেকের মধ্যে খাওয়া দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ, বিয়ের অনুষ্ঠান, সম্পত্তিতে অধিকার, জন্ম ও মৃতদেহ সৎকারের নিয়মকানুন পালনে রয়েছে ভিন্নতা। এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনাচরণের মধ্যে নানান সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

বিচিত্র সাংস্কৃতিক মিশ্রণ

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ জনসম্প্রদায়গুলোর বহুবছরের সহাবস্থানের ফলে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে আদান প্রদান মিথস্ক্রিয়া চলমান আছে। ফলে এক সংস্কৃতি আরেক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এভাবে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহাবস্থান ও মিশ্রণ ঘটতে থাকে। এই মিশ্রণ ঘটে ভাষা, খাবার দাবার, পোশাক পরিচ্ছদ, নানা উৎসব অনুষ্ঠান, আচার ও প্রথায়। এমনি করে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহাবস্থান ও মিশ্রণের মধ্যদিয়ে এদেশে যে সংস্কৃতি লক্ষ্য করি তাকেই একবাক্যে বলতে পারি 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি'।

কাজ- ১ : ধর্ম আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাপনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে?
কাজ- ২ : আমাদের সংস্কৃতিতে ভাষার প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
কাজ- ৩ : বাংলাদেশে নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বর্ণনা কর।

পাঠ- ২ ও ৩ : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি

গ্রাম ও শহর দুটোই রয়েছে বাংলাদেশে। এক সময় বাংলাদেশকে বলা হতো একটি বড়ো গ্রাম। তখন এ দেশের অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল কৃষি। গ্রামের কৃষকরা তাদের জমিতে নানা ফসল ফলাতো। কালের পরিক্রমায় এ দেশে শহর গড়ে উঠলেও তাতে গ্রামের প্রভাবই থেকে গিয়েছিল। পরে এক পর্যায়ে পরিবর্তন আসতে থাকে। গড়ে উঠতে থাকে বড়ো বড়ো শহর। জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়নের ফলে তৈরি হয় নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান। উৎপাদন হতে থাকে হরেক রকম পণ্য সামগ্রী। শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে এসে অনেকে শহরে বসবাস শুরু করে। শহরকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ব্যবসা বাণিজ্য। চাকরির সুবাদে গ্রাম থেকে শহরে আসে অনেকে। এভাবে গ্রামের মানুষের চেয়ে শহরে বাস করা মানুষের জীবনযাত্রা অনেকটা আলাদা হয়ে যায়। তবে একে অপরের সংস্কৃতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি

মানুষ যা করে, যা ভাবে, যা কিছু সে ব্যবহার করে এমন সকল কিছুই তার সংস্কৃতি। কাজেই গ্রামের মানুষ যে নানা ধরনের পেশার সাথে যুক্ত থাকে, ফলে সে যে আচরণ করে, যা সৃষ্টি করে বা যে ভূমিকা রাখে তার একত্রিত রূপই গ্রামীণ সংস্কৃতি। যে সব পেশাজীবী গ্রামে বাস করে তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, মাঝি, দর্জি, কবিরাজ, ডাক্তার, ওঝা, বৈদ্য, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত প্রভৃতি। এদের সবার সংস্কৃতিই গ্রামীণ সংস্কৃতি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতিকে আমরা দুইভাগে বিশ্লেষণ করতে পারি। ক. সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনভিত্তিক এবং খ. উৎসব ও বিনোদনভিত্তিক।

ক. সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনভিত্তিক

গ্রামীণ জীবন প্রধানত কৃষির সাথে জড়িত। কোনো কোনো মানুষের নিজের জমি আছে। জমির উৎপাদিত ফসলে তারা জীবন নির্বাহ করে। আবার যাদের জমি নেই তারা অন্যের জমিতে কাজ করে জীবনযাপন করে। তাদের জীবন কৃষির সাথে জড়িয়ে আছে। আগে কৃষক লাঙল গরু দিয়ে জমি চাষ করত। নিজে জমিতে সেচ দিত। এখন লাঙল গরুর পাশাপাশি অনেক জায়গায় ট্রাক্টর বা কলের লাঙল দিয়ে কৃষক জমি চাষ করছে। জল সেচ করছে শ্যালো বা ডিপ মেশিন দিয়ে। এসব করতে গিয়ে শহুরে জীবনের সাথে তাদের অনেকের যোগাযোগ হচ্ছে। ধীরে ধীরে গ্রামে শহুরে সংস্কৃতির প্রভাব পড়ছে।

চিত্র : কৃষক ধান কাটছে

'মাছ ভাতে বাঙালি' কথাটা কিছুকাল আগেও গ্রামের মানুষের জন্য প্রযোজ্য ছিল। কৃষকের গোলায় থাকত ধান। শ্রমের বিনিময়ে মজুরেরাও তার ভাগ পেতো। নদী নালা খাল বিলে থাকত প্রচুর মাছ। জাল ফেলে মাছ সংগ্রহ করা যেত। এখন অনেক নদী নালা ভরাট হয়ে গেছে। জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার বেশি ব্যবহার করায় এসবের নির্যাস পানিতে পড়ছে। এর প্রভাবে ছোটো ছোটো মাছ আর মাছের ডিম নষ্ট

হয়ে যাচ্ছে। তাই আগের মতো গ্রামে মাছ সহজলভ্য নয়। তবুও গ্রামের মানুষ সাধ্যমতো মাছ, ভাত, শাকসবজি, ডাল ইত্যাদি খায়। নানা ধরনের পিঠাপুলি তৈরি হয়। গ্রামের অনেকে শাকসবজি ফলিয়ে নিজেদের খাবারের চাহিদা মিটিয়েও বিক্রি করে থাকে।

একসময় গ্রামের মানুষ সাধারণ পোশাক পরতেন। পুরুষেরা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে অথবা গেঞ্জি বা ফতুয়া পরে কৃষিকাজ করতেন। কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে তারা পাজামা পাঞ্জাবি বা জামা পরতেন। মেয়েরা সাধারণত সুতির শাড়ি পরত। এখন কিছুটা শহুরে প্রভাব পড়েছে। কিশোর তরুণ ছেলেরা লুঙ্গি-শার্টের পাশাপাশি প্যান্ট শার্ট পরছে। মেয়েরা ফ্রক, সালোয়ার কামিজ আর শাড়ি পরছে।

আগে অঞ্চল ভেদে গ্রামের মানুষ মাটির ঘর, বাঁশ, কাঠ ও ছনের ছাউনি দেওয়া ঘরে বসবাস করত। এখন এসব ঘরের পাশাপাশি টিনের দোচালা, চৌচালা ঘর এবং ইটের দালানও তৈরি হচ্ছে।

গ্রামের মানুষ এক সময় পায়ে হেঁটেই চলাফেরা করত। কোনো কোনো অঞ্চলে গরুর গাড়ির ব্যবহার ছিল। বর্ষায় যাতায়াতের বাহন ছিল নৌকা। এখন রাস্তাঘাটের উন্নতি হওয়ায় রিক্সা ও মোটর গাড়িতে চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বৈঠা বাওয়া নৌকার বদলে এখন অনেক ক্ষেত্রে ইঞ্জিন চালিত নৌকা ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বেশিরভাগ মুসলমান। এরপরেই হিন্দু ধর্মের মানুষের অবস্থান। সংখ্যায় কম হলেও এদেশে বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। গ্রামীণ জীবনে সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে যার যার ধর্ম পালন করে থাকে।

খ. উৎসব ও বিনোদনভিত্তিক

গ্রামের মানুষ যুগ যুগ ধরে নানা ধরনের আনন্দ উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। এর কোনোটি সকল ধর্মের মানুষ মিলে মিশে করে আবার কোনোটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব।

বৈশাখী মেলা, নবান্ন উৎসব, ব্যবসায়ীদের হালখাতা উৎসব, নৌকাবাইচ, বিয়ে অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল ধর্মের মানুষ একসাথে উদযাপন করে থাকে। আগে গ্রামে বিনোদনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে রাতভর যাত্রা, পালাগান, কবিগানের আসর বসতো। এখন এসব হারিয়ে না গেলেও পরিবেশনা অনেক কমে গেছে।

চিত্র : নৌকা বাইচ

মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা। এছাড়া শবেবরাত, ঈদ-এ-মিলাদুননবী এবং ওয়াজ মাহফিলেও কিছুটা উৎসবের আমেজ থাকে।

হিন্দু ধর্মের মানুষ নানা পূজা উৎসব উদযাপন করে। যেমন– দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা, দোল পূর্ণিমা, রাস ও রথযাত্রা উৎসব ইত্যাদি। পূজা ছাড়াও আরও অনেক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান থাকে হিন্দু সমাজে।

বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ বুদ্ধপূর্ণিমাসহ নানা ধর্মীয় উৎসব পালন করে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও ক্রিসমাস ডে বা বড়দিনসহ আরো অনেক ধর্মীয় উৎসব পালন করে।

বাংলাদেশের শহুরে সংস্কৃতি

বাংলাদেশের শহুরে জীবনের সংস্কৃতিকেও আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। ক. সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনভিত্তিক এবং খ. উৎসব ও বিনোদনভিত্তিক।

চিত্র : শহরের বিল্ডিং

ক. সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনভিত্তিক

শহরের সংস্কৃতি অনেক দিক থেকে গ্রামের চেয়ে কিছুটা পৃথক। গ্রামের সকল মানুষ একে অন্যের খবর রাখে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা একত্রিত হয়। এ কারণে গ্রামীণ জীবনে সামাজিক বন্ধন বেশ অটুট। এদিক থেকে শহরবাসীর সামাজিক জীবনের গন্ডি বেশ ছোটো। একই দালানে থেকেও প্রতিবেশীদের সাথে তেমন যোগাযোগ থাকে না। শহরের শিশুরা যার যার বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে একা একা বড়ো হয়। শহরে খোলা মাঠ পাওয়া কঠিন। তাই শহরের শিশুদের খেলাধুলা ও ছুটাছুটি করা অনেক সময় সম্ভব হয় না।

শহরের মানুষ যার যার পেশা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। চাকরি, শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি শহরের মানুষের পেশা। আজকাল বড়ো বড়ো শহরে পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে। গ্রামের অনেক পুরুষ মহিলা এসব কারখানায় কাজ নিয়ে শহরে চলে আসে। গ্রাম থেকে আসা অনেকে ঠেলাগাড়ি, ভ্যানগাড়ি ও রিক্সা চালায়। মুটে মজুর হয়েও অনেকে জীবিকা অর্জন করে থাকে। তাদের কাছ থেকে গ্রামীণ সংস্কৃতির কোনো কোনো বিষয় শহুরে সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলছে। একইভাবে শহুরে সংস্কৃতির অনেক কিছু প্রভাব ফেলছে গ্রামীণ সংস্কৃতিতেও।

ভাত, মাছ, মাংস খেলেও শহুরে মানুষের খাবারে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। শহরের মানুষের অনেকেই ফাস্ট ফুডের দোকানে যায়। তাদের অনেকের কাছেই স্যান্ডউইচ, বার্গার ইত্যাদি প্রিয়। শহুরে মানুষের পোশাক পরিচ্ছদে অনেক বৈচিত্র্য ও চাকচিক্য রয়েছে।

খ. উৎসব ও বিনোদনভিত্তিক

শহরে বাস করা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ গ্রামের মানুষের মতই ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করে। এর বাইরে কোনো কোনো উৎসব শহরে কিছুটা ভিন্নভাবে পালিত হয়। শহরে পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন অনেক বেশি জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়। একুশের বইমেলাও এখন উৎসবের মতো উদযাপন করা হয়। টেলিভিশন ও সিনেমার পাশাপাশি মঞ্চনাটক দেখাও শহরের মানুষের জন্য একটি অন্যতম বিনোদন।

কাজ-১ : গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিগুলো চিহ্নিত কর।
কাজ-২ : গ্রামীণ ও শহরে উৎসব ও বিনোদন সংস্কৃতির তুলনা কর।

পাঠ- ৪ : বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন উপাদান

যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষ যে সংস্কৃতি লালন করে আসছে সাধারণ অর্থে তাই লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও এর বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

লোকসংস্কৃতির ধারণা

লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি সাধারণ মানুষ ও তার সমাজের সংস্কৃতি। অর্থাৎ লোকসমাজের সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির জন্ম সাধারণ মানুষের মুখে মুখে, তাদের চিন্তায় ও কর্মে। হাজার বছর ধরে এই সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

বাংলাদেশে আদিকাল থেকেই মানুষ লোকসংস্কৃতি লালন করছে। মানুষের মুখে মুখে চলা লোকসংস্কৃতির অনেক কিছুই সময়ের সাথে সাথে একটু একটু করে পরিবর্তন হয়েছে। লোকসংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়েছে গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের মধ্য থেকে। কতক রীতি বা আচারের উপর ভিত্তি করে লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠে। তার কয়েকটি হলো–

ভীতি থেকে : লোকসমাজে ভূতের ভয়ের অস্তিত্ব অনেক পুরাতন। যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করলে ভূত বলে কিছু নেই। কিন্তু লোকসমাজে ভূত থাকার ব্যাপারে গভীর বিশ্বাস রয়েছে। 'মানুষ মারা গেলেও আত্মা অমর' এই ধারণা থেকে ভূত থাকার ব্যাপারে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ অনেক ভূতের কথা কল্পনা করেছে। যেমন– মামদো ভূত, প্যাঁচাপেঁচি, শাঁখচুন্নি, পেতনি ইত্যাদি। আবার লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এই সব ভূত তাড়াতে ওঝারা ঝাড়ফুঁক, হলুদ পোড়া, মরিচ পোড়া ইত্যাদি প্রয়োগ করে।

গায়েহলুদ অনুষ্ঠান : গায়েহলুদ আমাদের সমাজের বিবাহরীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। গায়েহলুদ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ ও সংস্কার পালন করা হয়।

রোগ মুক্তির জন্য : হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে পির-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী বা মৌলবি-পুরোহিতদের কাছ থেকে তাবিজ-কবজ, পানিপড়া ইত্যাদি রোগ মুক্তির জন্য ব্যবহার করে।

চোখ লাগা থেকে বাঁচার জন্য : লোকসমাজে বিশ্বাস রয়েছে বাচ্চার ওপর অশুভ দৃষ্টি পড়লে ক্ষতি হতে পারে। সাধারণভাবে একে চোখ লাগা বলে। অশুভ দৃষ্টি কাটানোর জন্য তাই বাচ্চার কপালের পাশে কাজলের টিপ দেওয়া হয়।

বৃষ্টি নামানোর জন্য : অনেক দিন খরা হলে অর্থাৎ বৃষ্টি না নামলে কৃষক খুব চিন্তায় পড়ে যায়। চাষাবাদের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। বৃষ্টি নামানোর জন্য গ্রামের মেয়েরা একটি অনুষ্ঠান করে। তারা কুলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায়। মুখে বৃষ্টির গান গায় বা ছড়া কাটে। বাড়ির মেয়েরা কুলার ওপর পানি ঢেলে দেয়। তারা বিশ্বাস করে এভাবেই আকাশ থেকে বৃষ্টি নামবে। আধুনিক সেচ ব্যবস্থার কারণে এ রীতির প্রচলন বর্তমানে নেই বললেই চলে।

লোকসংস্কৃতির উপাদান

যেসব বিষয়ে লোকসংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে তাকে লোকসংস্কৃতিকর উপাদান বলা হয়। সাধারণত এই উপাদান দুই ধরনের হতে পারে। ক. বস্তুগত উপাদান ও খ. অবস্তুগত উপাদান।

ক. বস্তুগত উপাদান : লোকসংস্কৃতির যেসব উপাদান ধরা যায় ছোঁয়া যায় তা বস্তুগত উপাদান। যেমন-
লোকশিল্প : তাঁতশিল্প, শাখা বা শঙ্খশিল্প, কাঁসাশিল্প, মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা, বেতশিল্প ইত্যাদি।
লোকবিজ্ঞান : তাঁতশিল্পের চরকা, মাছধরার চাই, লাঙল-কাস্তে ইত্যাদি তৈরির প্রযুক্তি।
লোকযান : নৌকা, পালকি ইত্যাদি।

এসব ছাড়াও রয়েছে লোকতৈজসপত্র, লোকবাদ্য, লোকঅলংকার ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান।

খ. অবস্তুগত উপাদান : যেসকল সাংস্কৃতিক বিষয় ধরা বা ছোঁয়া যায় না অর্থাৎ মানুষের চিন্তা থেকে জন্ম নেয় এবং মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে তাকে লোকসংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদান বলা হয়। অবস্তুগত উপাদানের প্রধান বিষয়টিই হচ্ছে সাহিত্য। এসব সাহিত্যের লিখিত রূপ নেই। মানুষের মুখে মুখে তা ছড়িয়ে আছে। এ ধারার সাহিত্য লোকসাহিত্য নামেও পরিচিত। যেমন–লোককাহিনি বা কিসসা, লোকগীতি, লোকচিকিৎসা, লোকক্রীড়া, লোকসংগীত, প্রবাদ-প্রবচন, ডাকের কথা, খনার বচন, ছেলে ভুলানো ছড়া, ধাঁধা, লোকনাটক ইত্যাদি।

এছাড়াও লোক উৎসব, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদিও অবস্তুগত উপাদান।

কাজ-১ :	তোমাদের পারিবারিক জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে লোকসংস্কৃতির উপাদান চিহ্নিত কর।
কাজ-২ :	বস্তুগত ও অবস্তুগত লোকসংস্কৃতির তুলনা কর।

পাঠ- ৫ : বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি

বাংলাদেশে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষ বাঙালি। তবে এদেশে প্রায় ৫০টির কাছাকাছি ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষও বাস করে। তাদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আনন্দ-উৎসব এগুলো তাদের পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয়কে তুলে ধরে।

বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীর বসবাস

বাঙালির বাইরে অন্য নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এ অঞ্চলে বসবাস করে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, খুমিসহ আরও অনেক নৃগোষ্ঠী।

বৃহত্তর ময়মনসিংহে বসবাসকারী ভিন্ন নৃগোষ্ঠী হচ্ছে গারো, হাজং। সিলেট অঞ্চলে রয়েছে খাসিয়া ও মণিপুরিদের বাস। উত্তরবঙ্গ-বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে বাস করে সাঁওতাল ও ওঁরাওসহ অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়। আর কক্সবাজার ও পটুয়াখালী অঞ্চলে বাস করে রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ।

ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি

এদেশের সকল নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। নিচে এদের সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়া হলো:

ধর্ম: বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ একসময় প্রকৃতি পূজা করত। প্রকৃতির প্রতি এই মমত্ববোধ ও ভক্তি এখনও তাদের মাঝে বিদ্যমান। তারা বিশ্বাস করে যে, মানুষ প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতি মানুষের অধীন নয়। একারণেই তারা পূজা পার্বণ, সামাজিক রীতি নীতি, দৈনন্দিন জীবন যাপন সর্বত্র নানাভাবে প্রকৃতিকে রক্ষা করার গুরুত্ব তুলে ধরে। কিন্তু ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক শক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে এবং আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়ে যাওয়ায় নৃগোষ্ঠীগুলো আধুনিক সভ্যতার ধর্ম, বিশ্বাস, রীতি নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেক সম্প্রদায় নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। যেমন: চাকমা, মারমা, রাখাইনসহ অনেক নৃগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। আবার গারো, সাঁওতাল, ওঁরাওসহ অনেক নৃগোষ্ঠী খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু এরপরও চাকমা, মারমা, রাখাইন, গারো, সাঁওতাল, ওঁরাওসহ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ এখনো প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে তাদের জীবনে ধরে রেখেছে। যেমন: নৃগোষ্ঠীর গোত্র ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোত্রের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয় প্রকৃতির নানা উপাদান যথা, গাছ পালা, পশু-পাখি ইত্যাদি।

আনন্দ উৎসব

বাংলাদেশের প্রায় সকল নৃগোষ্ঠীর মানুষ নাচগানের মধ্য দিয়ে আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকে। রাধা-কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কীর্তন ও নাচ করা মণিপুরিদের সবচেয়ে প্রিয়। একে 'গোপী নাচ' বলা হয়। বসন্তকালে তারা জাঁকজমকের সাথে হোলি উৎসব পালন করে। ওঁরাওরা ফাল্গুন মাস থেকে বছর গণনা শুরু করে। নববর্ষকে বরণ করতে তারা পালন করে ফাগুয়া। সাঁওতালরা পালন করে সোহরাই, বাহা, পাসকা পরবসহ নানা উৎসব। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিজু এই তিনটিকে সমন্বয় করে বর্তমানে সবাই একত্রে পালন করে 'বৈসাবি'। মারমা ও রাখাইনরা নববর্ষের উৎসবে ধুমধামের সাথে পালন করে জল উৎসব। উল্লেখ্য যে, নৃগোষ্ঠীর আনন্দ-উৎসবের অধিকাংশ এখনও ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত।

লোকবিশ্বাস

পৃথিবীর অন্য সব নৃগোষ্ঠীর মতো বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে নানা ধরনের বিশ্বাস কাজ করে। যেমন, মণিপুরি ও অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম অনুসারী সম্প্রদায়ের কাছে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার রাত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ণিমার রাতে এরা অনেক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করে থাকে। নানা সংস্কারের প্রচলন আছে তাদের মধ্যে। যেমন, ওঁরাওরা বিশ্বাস করে যে, পৌষ মাসে গৃহনির্মাণ ও ছাউনি দেওয়া অকল্যাণ। গারোদের বিশ্বাস এই যে, রাত্রে ঘর ঝাড়ু দিয়ে ময়লা বাইরে ফেলতে নেই। বর্মনরা মনে করে মাঘ মাসে মূলা খাওয়া উচিত নয়। খিয়াংরা মনে করে নবজাতক সন্তানকে ছুঁতে হলে আগুনে হাত একটু গরম করে নিতে হয়। তা না হলে শিশুর অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিয়ে

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী সমাজে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী একে অপরের পছন্দ করার সুযোগ থাকলেও সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় পারিবারিক ও সামাজিক নিয়মে। বেশিরভাগ নৃগোষ্ঠীরই অন্য গোত্রের মধ্যে বিয়ে না করার রীতি রয়েছে। আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি বিয়ে নিয়ে রয়েছে নানা বিশ্বাস। যেমন, পাংখোয়ারা জুলাই মাসে বিয়ে করা এবং বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াও নিষিদ্ধ মনে করে। এ সময় বিয়ে হলে বা বিয়ের সূত্রপাত হলে সংসার সুখের হয় না বলে তারা মনে করে। মাহাতোরা অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে করেনা। আর খাসিয়া ও গারো মাতৃসূত্রীয় সমাজে যেহেতু মায়ের কাছ থেকে কন্যা সমুদয় সম্পত্তি পাবার রীতি প্রচলিত, তাই আশা করা হয় যে, মেয়ের জামাই বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রীর পরিবারের সাথে বাস করবে।

পোশাক ও অলংকার

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ নিজেরাই নিজেদের পোশাক তৈরি করে থাকে। চাকমা পুরুষদের প্রধান পোশাক লুঙ্গি ও শার্ট। মেয়েরা সাধারণত নিচের অংশে লাল ও কালো রঙের পোশাক পরে থাকে। এর নাম 'পিনোন'। উপরের অংশে তারা একধরনের ব্লাউজ পরে। মারমা নারীদের পোশাককে বলে 'থামি'। ওঁরাওরা ধুতি ও শার্ট পরে। অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ নানা ধরনের অলঙ্কার পরে থাকে। চাকমা মেয়েরা বালা, নেকলেস ও কানের দুল পরে। সাঁওতাল ও ওঁরাও মেয়েরা হাত, গলা, কান ও পায়ের আঙুলে পরে নানা ধরনের অলংকার। অতি প্রাচীনকাল থেকে ওঁরাও মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারগুলো হচ্ছে: কানখুলি (কানের লতিতে পরে), তিপার পাতা (কানের উপরের অংশে পরে), নোলক (নাকের সামনে পরে), নাকচনা (নাকের ফুল), হাসলি (গলায় পরে) ইত্যাদি। গারো নারীদের ঐতিহ্যগত পোশাক দকমান্দা, দকশাড়ি ইত্যাদির পাশাপাশি রয়েছে খকানিল, রিকমাচু, পেনতাসহ হরেক রকমের অলঙ্কার। অন্যান্য নৃগোষ্ঠীরও নানারকম অলংকার পরার রেওয়াজ আছে।

খাদ্য ও পানীয়

কোনো কোনো নৃগোষ্ঠীর মানুষ বিশ্বাস করে একটি নির্দিষ্ট প্রাণী হচ্ছে তাদের গোত্রের প্রতীক। এই বিশ্বাসকে টোটেম বলে। সাধারণত যেকোনো নৃগোষ্ঠীর মানুষের কাছে তাদের নিজ নিজ টোটেম খাওয়া নিষিদ্ধ। যে কোনো ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ কিংবা পান কিংবা মাংস ভক্ষণ রীতি মনিপুরীদের সমাজে নিষিদ্ধ। ধর্মীয় উৎসবাদিতে মাছও নিষিদ্ধ। প্রতিটি নৃগোষ্ঠীরই রয়েছে এক বা একাধিক বিশেষ পছন্দের খাবার। যেমন– 'নাখাম' অর্থাৎ শুঁটকি মাছ গারোদের প্রিয় খাদ্য। ওঁরাওদের মধ্যে পিঠা-পুলি এতটাই জনপ্রিয় যে পৌষসংক্রান্তি এবং ভাদ্র মাসের ১৩ তারিখে শুধু পিঠা তৈরি ও খাওয়ার জন্যই তারা বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর কাছে নাপ্পি বা সিঁদোল (চিংড়ি বা এ জাতীয় শুঁটকি মাছের গুড়া) অতি প্রিয়। ভাত থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এক ধরনের পানীয় অধিকাংশ নৃগোষ্ঠীর মানুষের বিশেষ পছন্দ।

কাজ : বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নবান্ন উৎসব হয় কোন ঋতুতে?

ক. বর্ষা খ. শরৎ

গ. হেমন্ত ঘ. শীত

২. বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য রয়েছে, কারণ–

i. বাঙালি সংকর জাতি

ii. এ দেশের ঋতু বৈচিত্র্যপূর্ণ

iii. বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকজনের অবস্থান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ঝুমার দাদা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন। নদীর উত্তর দিকে তাদের বাড়ি ছিল। বাড়ির পাশেই ছিল একটি মসজিদ। গোয়াল ঘরটি ছিল বাড়ির পিছনে। সে সময়ে মতি মাঝি ঐ নদীর উপর দিয়ে মনের খুশিতে ভাটিয়ালি গান গেয়ে যেত।

৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন দুর্যোগকে ইংগিত করা হয়েছে?

ক. জলোচ্ছ্বাস খ. নদী ভাঙ্গন

গ. অনাবৃষ্টি ঘ. বন্যা

৪. উক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও মতি মিয়ার মতো এদেশের মানুষের খুশি হওয়ার প্রধান কারণ–

i. জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব

ii. নদনদীর বিপুল সম্পদ

iii. দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বাংলা প্রথম মাসের প্রথম দিন। ফারিবা, রাইসা, রূপন্তি, প্রিয়তি সকলে মিলে ঠিক করে তারা রমনা বটমূলে যাবে। সকলে লাল-সাদা রঙের শাড়ি পরবে। সেখানে মেলায় গান ও কবিতা শুনবে। প্রতি বছরই এখানে অনেক মানুষের সমাগম হয়। তারা মুখোশ পরে, গান গায়, অনেকে আবার মুখে বিভিন্ন ছবি আঁকে। সারাদিন আনন্দ উচ্ছ্বাসে কাটায়।

ক. বাংলা প্রথম মাসের নাম কী?

খ. বাংলাদেশের কৃষি প্রধানত কীসের উপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন মেলার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে উদ্দীপকের বর্ণিত মেলার ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

২. শান্তা ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি ভিন্ন নৃগোষ্ঠী পরিবারের সন্তান। অন্তরা শান্তার সাথে ময়মনসিংহে তার বাড়িতে বেড়াতে যায়। সে দেখলো শান্তার বাবা শান্তার মায়ের বাড়িতে বসবাস করে। শান্তা অন্তরাকে জানাল যে সে পরিবারের ছোটো কন্যা হওয়াতে বিয়ের পরও এ বাড়িতে থাকবে এবং সমুদয় সম্পত্তির মালিক হবে। শান্তারা এক সময় গাছপালা, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদির পূজা করত। এখন তারা টিভি দেখে। তাদের এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। তাদের নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা এখন ব্যাপকভাবে লেখাপড়া শিখছে ফলে তাদের খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিরও পরিবর্তন এসেছে।

ক. 'গোপী নাচ' কোন নৃগোষ্ঠীর উৎসব?

খ. 'বৈসাবি' বলতে কী বোঝায়?

গ. শান্তা কোন নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "শান্তার মতো অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে"– বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।